প্রধানমন্ত্রীর উক্তি এবং শিক্ষক

● সামসুল আনোয়ার মানিক ●

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার একটি কথা শুনে সেদিন আমার হাসির উদ্রেক হয়েছে। সচরাচর আমি মানুষের কথায় হাসি না। হাস্যরসের কথা বললেও না। সেজন্যে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে আমাকে প্রায়ই 'গোমড়া', 'কাটখোট্টা', নীরস'-এসব অপবাদ সহ্য করতে হয়। কিন্তু তারা বোধ হয় জানেন না যে, কোন কোন সময় আমি ঠিকই হেসে ফেলি। হাসির মত কথা হলে না হেসে পারি না। যেমন প্রধানমন্ত্রীর কথা শুনে সেদিন আমার হাসির উদ্রেক হয়েছিলো। কথাটা তিনি বলেছিলেন কয়েকদিন আগে উত্তরা হাই স্কুল ও কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে। চমৎকার ভাষণ দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। আজকাল বেশ গুছিয়েই বক্তৃতা দিতে পারেন তিনি। বক্তব্য সুন্দর, বাচনভঙ্গিও চমৎকার। সেদিনকার সেই অনুষ্ঠানেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। তিনি বলছিলেন, মহানগরীতে জনসংখ্যার চাপ কমানোর জন্যে শহরতলী এলাকায় নাগরিক সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। সরকার তার পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল আধুনিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধাসহ উত্তরা উপ-শহরকে গড়ে তুলতে এবং একটি পরিকল্পিত উপায়ে বৃহত্তর মহানগরী এলাকার উন্নয়ন করতে চান।

প্রধানমন্ত্রীর মুখে ঢাকা মহানগরীর উন্নয়নের কথা শুনতে কার না ভালো লাগে? সবারই ভালো লাগার কথা। আমারও লেগেছিলো। হতাশ মানুষকে আশার কথা শোনালে তারা প্রীত হয়, আনন্দিত হয়। আর সেই আশা ও প্রতিশ্রুতির কথা যদি সরকার প্রধানের মুখ থেকে উচ্চারিত হয়, তাহলে তো আনন্দের কোন সীমাই থাকে না। কিন্তু আনন্দের কথা শুনে কি কেউ হাসে? হ্যাঁ, কখনো কখনো আনন্দের কথা শুনেও মানুষ হাসে বটে। তবে প্রধানমন্ত্রীর সেই আশা-আনন্দ মিশ্রিত মধুর বাণী শুনে কিন্তু আমি হাসিনি। আমি হেসেছিলাম অন্য একটি কথার জন্যে, যা তিনি সেদিনকার ভাষণেই অত্যন্ত সুনিপুণভাবে ব্যবহার করেছিলেন। সেই কথাটা ব্যবহার না করলেও চলতো। 'কথাটা' মাইনাস করে বক্তব্য রাখলে হয়তো ব্যাপারটি আরো শোভন হতো, যুক্তিসঙ্গত হতো। 'সরকার কিছু করতে চান'- একথা বললে তা নিয়ে তর্কের অবকাশ কম থাকে। সে ধরনের বক্তব্যে বরং সরকারের সদিচ্ছা বা আন্তরিকতাই প্রকাশ পায়। কিন্তু তা না বলে যদি নিছক বাহাদুরী নেয়ার জন্যে বলা হয়, 'সরকার এটা করেছেন'- তা হলে সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন উঠবে সরকার আদতে তা করেছেন কি-না। অর্থাৎ এমন বক্তব্যে তর্কের অবকাশ থাকবে। সন্দেহ তো থাকবেই। অতএব, সরকার প্রধান হিসেবে কোন বক্তব্য রাখার আগে ভেবে-চিন্তে বক্তব্য রাখা ভালো। রেখে-ঢেকে কথা বলাই সমীচীন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সেদিন তাঁর বক্তব্য সেভাবে শেষ করেননি। ভাষণের এক পর্যায়ে তিনি এই বলে উক্তি করেছেন যে, সরকার শিক্ষার ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। কেননা সরকার মনে করেন, শিক্ষিত জনগণ ছাড়া দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। বস্তুতঃ এ কথাটিই আমার হাসির উদ্রেকের কারণ।

আগেই বলেছি, 'সরকার কিছু করতে চান'- এমন কথা বললে এ নিয়ে বিতর্কের কিছু থাকে না। কিন্তু যখনই সরকার কিছু করেছেন বা দিয়েছেন বলে দাবী করেন তখন প্রশ্ন উঠবে হিসাব-নিকাশের। জনগণ জানতে চাইবে সরকার কি করেছেন বা দিয়েছেন। এই যে প্রধানমন্ত্রী বললেন, 'সরকার শিক্ষার ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন' এ কথাটা কি ঠিক? তা হলে সমুদয় শিক্ষা ব্যবস্থার আজ এই হাল কেন? কেন বেসরকারী শিক্ষকরা আজ পথে নেমেছেন ধর্মঘটের জন্যে? কেন উন্নয়ন খাতের প্রাথমিক শিক্ষকরা মাসের পর মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না? কেন সন্ত্রাসের মুখে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে? এই ক'দিন আগেও সিলেটের ওসমানী মেডিকেল কলেজ বন্ধ হয়ে গেলো। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অঘোষিত বন্ধ -সেও তো আজ কয়েক মাস ধরেই। লেখাপড়া বন্ধ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সন্ত্রাসের কারণে দীর্ঘকাল বন্ধ থেকে খুললেও যে কোন সময় আবার সন্ত্রাসের কারণে বন্ধ হয়ে যেতে পারে। বলতে গেলে আজ কোন বিশ্ববিদ্যালয় অথবা কলেজেই লেখাপড়ার পরিবেশ নেই। সন্ত্রাসের তপ্ত বাতাস হাই স্কুলগুলোর পরিবেশকে সেভাবে কলুষিত না করলেও সেই স্কুলগুলোর লেখাপড়াও কার্যতঃ বন্ধ হয়ে গেছে। কারণ বেসরকারী শিক্ষকরা ধর্মঘটে আছেন। এই ধর্মঘট কতদিন স্থায়ী হবে বলা যাচ্ছে না। কেননা শিক্ষকরা দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। এদিকে সরকারও শিক্ষক নেতৃবৃন্দের সাথে তাদের দাবী-দাওয়া নিয়ে কথা বলতে খুব একটা আগ্রহী বলে মনে হচ্ছে না। যে কারণে সরকারপন্থী শিক্ষক দলও শেষ পর্যন্ত ধর্মঘটে যেতে বাধ্য হয়েছে। এই দলের সাথে নাকি সরকারের কথা হয়েছিলো ২৫শে জানুয়ারী শিক্ষক সমাবেশে শিক্ষা মন্ত্রী বেসরকারী শিক্ষকদের দাবী মেনে নিয়ে একটি ঘোষণা দেবেন। কিন্তু পরবর্তীতে সেই সমাবেশ আর হয়নি। হয়নি এ জন্যে যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে সরকার বেসরকারী শিক্ষকদের দাবী মানতে রাজী নন। সরকারের বক্তব্যঃ বেসরকারী শিক্ষকদের দাবী নীতিগতভাবে তারা মেনে নিয়েছেন। কিন্তু এবার বাজেটে টাকা নেই বলে বেসরকারী শিক্ষকদের দাবী বিবেচনা করা সম্ভব নয়- এটাই

বেসরকারী শিক্ষকদের ক্ষুব্ধ হওয়ার কারণ অত্যন্ত স্বাভাবিক। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় তাদের অবদান সর্বাধিক হওয়া সত্ত্বেও তারা আজ চরম উপেক্ষার শিকার। সরকারী এবং বেসরকারী শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত সরকারের বৈষম্য নীতিই বেসরকারী শিক্ষা এবং শিক্ষকদের চরম দুর্দশার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। এই বৈষম্য নীতির খানিকটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। দেশে সর্ব মোট ২২৩টি সরকারী কলেজ রয়েছে। এসব কলেজে ৬ হাজার ৮শ' ১৫ জন কলেজ শিক্ষক কর্মরত আছেন। ৩ লাখ ৯ হাজার ১শ' ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী লেখাপড়া করছে এসব সরকারী কলেজে। পক্ষান্তরে দেশে বেসরকারী কলেজের সংখ্যা মোট ৬৫১টি। শিক্ষক সংখ্যা ১১ হাজার ৪শ' ৬১ জন। ছাত্র সংখ্যা ৬ লাখ ৫৪ হাজার ১শ' ৬ জন। অর্থাৎ কলেজই বলি, শিক্ষকই বলি আর ছাত্রই বলি বেসরকারী খাতেই এগুলোর সংখ্যা বেশী। শুধু বেশী নয়, কয়েক গুণ বেশী। অথচ ১৯৯১-৯২ অর্থ বছরে সরকারী কলেজ খাতে ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ হচ্ছে ৭৫ কোটি ৩৪ লাখ টাকা। পক্ষান্তরে বেসরকারী কলেজ খাতে সরকারী বরাদ্দের পরিমাণ মাত্র ৫০ কোটি ১৭ লাখ টাকা। সরকারী ও বেসরকারী স্কুলের ক্ষেত্রেও একই প্রকার বৈষম্য বিদ্যমান। দেশে সরকারী স্কুলের সংখ্যা ৩০৭টি। সরকারী স্কুল শিক্ষকের সংখ্যা ৬ হাজার ১শ' ৮৯ জন। ছাত্র সংখ্যা ১ লাখ ৯০ হাজার ৩৯ জন। পক্ষান্তরে দেশে বেসরকারী স্কুলের সংখ্যা ১০ হাজার ৬শ' ৮৯টি। অর্থাৎ সরকারী স্কুলের তুলনায় ৩৩ গুণ বেশী। বেসরকারী স্কুল শিক্ষকের সংখ্যা ১ লাখ ১৬ হাজার ৬শ' ৮৯ জন। সরকারী স্কুল শিক্ষকের তুলনায় ১৯ গুণের মত। বেসরকারী স্কুলে ছাত্র সংখ্যা ৩৩ লাখ ৩৫ হাজার ৬শ' ২০ জন। এখানেও দেখা যাচ্ছে সরকারী স্কুলের ছাত্র সংখ্যার চেয়ে বেসরকারী স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ১৬ গুণ বেশী। কিন্তু ১৯৯১-৯২ অর্থ বছরে সরকারী স্কুলে ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ৪৩ কোটি ৩১ লাখ টাকা, পক্ষান্তরে বেসরকারী স্কুলে ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ২০৪ কোটি ১৪ লাখ টাকা। অর্থাৎ সরকারী স্কুলে বরাদ্দকৃত অর্থের তুলনায় ৪ গুণের সামান্য কিছু বেশী অর্থ বেসরকারী স্কুলের জন্যে বরাদ্দ করা হয়েছে। দেশের মোট শিক্ষার্থীর ৯০ শতাংশই যেখানে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করছে, সেখানে সরকারী ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ যে নিতান্তই সামান্য তা এই পরিসংখ্যানেই সুস্পষ্ট।

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় এই বৈষম্য যে বর্তমান সরকারেরই সৃষ্টি এমন নয়। যুগ যুগ ধরে এই বৈষম্য চলে আসছে এবং তা চলে আসছে বলেই অন্যান্য ক্ষেত্রের মত শিক্ষা ক্ষেত্রেও মান ও গুণগত পরিবর্তন সাধিত হয়নি। যতই দিন যাচ্ছে ততই হ্রাস পাচ্ছে শিক্ষার মান। যদি বলা হয়, সরকারের এই বৈষম্য নীতিই শিক্ষার মান হ্রাস পাওয়ার একটি প্রধান কারণ, তা হলে মোটেই তা বাড়িয়ে বলা হবে না। কেননা সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে দেশের মোট শিক্ষার্থীর মাত্র ১০ শতাংশের পেছনে যে অর্থ ঢালা হচ্ছে, বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠরত শতকরা ৯০ জন ছাত্রের পেছনে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে তার চেয়ে অনেক কম। ভালো লেখাপড়ার জন্যে যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা থাকা উচিত বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তা নেই বা থাকলেও আর্থিকভাবে সচ্ছল গুটিকতক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ। শিক্ষক স্বল্পতা, শিক্ষা উপকরণের অভাব-- এগুলোতো বেসরকারী স্কুল-কলেজের একটা 'ক্রনিক প্রোবলেম'। এর ওপর রয়েছে আর্থিক সংকটজনিত অনিয়মিত বেতনের ঘাপলা, যার প্রত্যক্ষ শিকার বেসরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীরাই। এমন বহু স্কুল-কলেজ রয়েছে যেখানে শিক্ষক-কর্মচারীরা নামমাত্র বেতন পাচ্ছেন। তাও প্রায় ক্ষেত্রেই অনিয়মিত। সরকার প্রদত্ত টিচার্স বেনিফিটই তাদের জন্যে প্রধান ভরসা। ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত বেসরকারী স্কুল ও কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্যে 'টিচার্স বেনিফিট' প্রথা প্রচলিত ছিলো। ১৯৮০ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে সেই প্রথা তুলে দিয়ে সরকার বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের জাতীয় বেতন স্কেলের অন্তর্ভুক্ত করে বেতন বাবদ শতকরা ৫০ ভাগ সরকারী তহবিল থেকে দেয়ার বিধান চালু করেন। ১৯৯১ সালের জুন মাস পর্যন্ত সাড়ে এগারো বছর ধরে সেই নিয়মই চালু ছিলো। অর্থাৎ এ সময়কালে সরকারী কর্মচারীদের জন্যে যে ক'বার বেতন বেড়েছে বা জাতীয় বেতন স্কেলের পরিবর্তন হয়েছে সে অনুযায়ী বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্যেও ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এই ধারাবাহিকতায় শুধু ছেদ পড়লো বর্তমান সরকারের আমলেই। এ সরকার ক্ষমতায় বসার কয়েক মাসের মধ্যেই নতুন জাতীয় বেতন স্কেল ঘোষণা করলেন। সে অনুযায়ী সরকারী শিক্ষক-কর্মচারীসহ অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্যে ১৯৯১-৯২ অর্থ বছরের বাজেটে ব্যয় বরাদ্দও দেখানো হলো। শুধু বাদ রাখা হলো বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের। কেন, শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে কি তারা অপরাধ করেছেন? নাকি জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য শিক্ষক সমাজকে স্পর্শ করছে না? সবার বেতন বাড়বে, অথচ শিক্ষকরা তাদের ন্যায্য পাওনা পাবেন না-- এ কেমন বিচার?

এরশাদ সরকারকে স্বৈরাচারী সরকার বলে আখ্যায়িত করা হয়। অথচ সেই স্বৈরাচারী আমলেও তো এমনটা ঘটেনি। সেই আমলে সরকারী কর্মচারীদের জন্যে বেতন বাড়ানো হলে বেসরকারী শিক্ষকদের জন্যেও প্রচলিত বিধান অনুসারে বেতন বাড়ানো হয়েছে। আগের প্রতিটি সরকার যেখানে শিক্ষকদের স্বার্থের প্রশ্নে সহানুভূতিশীল ছিলেন, সেখানে বর্তমান সরকারের অনুভূতিটা এ ব্যাপারে হঠাৎ ভোঁতা হয়ে গেলো কেন আমরা তা বুঝতে অক্ষম। শিক্ষকরা কি সমাজের বাইরে? তাদের কি পেটে ক্ষুধা নেই? তারা কি ন্যায্য পাওনার দাবী তুলতে পারেন না? আর এটাকে 'দাবী'ই বা বলি কোন্ যুক্তিতে? এটা তো তাদের প্রাপ্য। এত দিন তারা যা পেয়ে এসেছেন, এখন তা পাবেন না

ধর্মঘট

কেন?

আসলে শিক্ষকদের স্বার্থ নিয়ে বর্তমান সরকারের আগ্রহই কম। নতুবা শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী একজন শিক্ষক হয়েও কি করে বলতে পারেন ধর্মঘটী শিক্ষকদের দাবী পূরণ করা সম্ভব নয়! সম্প্রতি দৈনিক বাংলার বাণীর সাথে এক সাক্ষাৎকারে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অধ্যক্ষ মোহাম্মদ ইউনুস প্রকারান্তরে সে কথাই বলেছেন। তিনি বলেছেন, ধর্মঘটী বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক-কর্মচারীদের জাতীয় বেতন স্কেলে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নয়। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী শুধু এ কথা বলেই ক্ষান্ত হননি।

আরো কঠিন ভাষায় এ কথাও বলেছেন যে, ইচ্ছা করলে সরকার বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে অনুদান দেয়া পুরোপুরি তুলে নিতে পারেন। বেসরকারী স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসাগুলো ভালোভাবে চলে না বলেই তাদের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে শতকরা ৭০ ভাগ অনুদান এবং শতকরা ২০ ভাগ মহার্ঘভাতা হিসেবে দেয়া হচ্ছে বলে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী মন্তব্য করেছেন এবং বলেছেন, এই অনুদান অব্যাহত রাখতে সরকারের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। শিক্ষকদের স্বার্থের ব্যাপারে কতটা অনুদার হলে সরকারের একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি হয়ে এমন মন্তব্য করতে পারেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর উপরোক্ত বক্তব্যই তার বড় প্রমাণ। আর শিক্ষকদের স্বার্থের ব্যাপারে এমন মনোভাব পোষণ করে যে সরকার, সেই সরকারকে আর যাই বলা হোক না কেন, অন্ততঃ একথা বলা যায় না যে শিক্ষার প্রতি সে সরকারের দরদ বা অনুরাগ আছে। তাই সরকারের এই মনোভাব নিয়ে বেসরকারী শিক্ষকদের ক্ষোভ থাকা খুবই স্বাভাবিক। আর সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ যদি ধর্মঘটের মধ্যদিয়ে ঘটেই যায়, তাহলে বিস্ময়েরই বা কি থাকতে পারে? ধর্মঘট তারা হঠাৎ শুরু করেননি। আগস্ট মাস থেকেই শিক্ষকরা তাদের দাবী-দাওয়ার জন্যে আন্দোলনে নেমেছেন। তাতে কোন কাজ হয়নি বলেই ১৫ দফা দাবী নিয়ে তারা

এখন ধর্মঘট শুরু করেছেন। আমরা চাইনি যে, শিক্ষকরা ধর্মঘটে যান। কেননা এমনিতেই দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার বারোটা বাজার উপক্রম হয়েছে। ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসের কারণে লেখাপড়ার পরিবেশ হচ্ছে মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত। গোলযোগের কারণে বছরের অনেক ক'টা দিনই স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকে। এর ওপর যদি শিক্ষকরা ধর্মঘটে যান তাহলে লেখাপড়ার অসামান্য ক্ষতি হবে। আর লেখাপড়ার ক্ষতি মানেইতো শিক্ষার ক্ষতি। শিক্ষার ক্ষতি হলে জাতির ক্ষতি, দেশের ক্ষতি, দেশের মানুষের ক্ষতি। জাতীয় জীবনে এমন ক্ষতির প্রভাব কত সুদূরপ্রসারী তা কেবল একটি বিচক্ষণ ও দূরদর্শী সরকারের পক্ষেই উপলব্ধি করা সম্ভব। বর্তমান সরকারের সেটা উপলব্ধি করার মত মেধা বা দূরদর্শিতা নেই বলেই হয়তো বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের দাবী-দাওয়া পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। নতুবা সব খাতে অর্থের সংস্থান হয়, শুধু বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের ক্ষেত্রে অর্থের টান পড়বে কেন? অস্বীকার করি না যে, আমাদের আর্থিক সীমাবদ্ধতা নেই। সরকারের হাতে 'আলাদীনের চেরাগ'ও নেই যে, তা দিয়ে ইচ্ছামত সব দাবী পূরণ করা সম্ভব। কোন সরকারের হাতেই তা থাকে না। তবুতো এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও সরকার একটা নতুন জাতীয় বেতন স্কেল দিয়েছেন। এর জন্যে অতিরিক্ত অর্থের সংস্থান সরকারকে করতে হয়েছে। আমাদের প্রশ্ন, সবার জন্যে তা সম্ভব হলে শুধুমাত্র বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের বেলায় তা সম্ভব হবে না কেন? আর বেসরকারী শিক্ষক, দেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে যাদের অবদান সবচাইতে বেশী- তাদের ঠকিয়ে কি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি করা সম্ভব? কৃষকের কল্যাণ ছাড়া যেমন কৃষির উন্নতি হতে পারে না, শ্রমিকের কল্যাণ ছাড়া যেমন শিল্পের উন্নতি হতে পারে না, তেমনি শিক্ষকের কল্যাণ ছাড়া শিক্ষারও কোন উন্নতি সম্ভব নয়-- এটা উপলব্ধি করতে হবে। অথচ বর্তমান সরকার বেসরকারী শিক্ষকদের বেতনের ব্যাপারেই কেবল তাদের ঠকাননি, বিগত সরকারের আমলে বেসরকারী শিক্ষকদের জন্যে গঠিত শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্টও তুলে দিয়েছেন।

শিক্ষকদের স্বার্থ বিরোধী এ কাজ করার পরেও যখন সরকার প্রধানের মুখ থেকে শুনতে হয় বর্তমান সরকার শিক্ষার ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন তখন বাস্তবিকই না হেসে উপায় থাকে না। হাসির সাথে মনে উদয় হয় একটি প্রশ্ন- গুরুত্বটা কোথায় কিভাবে দিয়েছেন সরকার? বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প সেওতো সাবেক সরকারের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। গণশিক্ষা কার্যক্রম? না, সেটাও বর্তমান সরকারের আবিষ্কার নয়। এ সবই পূর্ববর্তী সরকারগুলোর কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। তবে শিক্ষা ক্ষেত্রে কোন কিছু করার বাহাদুরীটা কোথায় এই সরকারের? গুরুত্বের চিহ্নই বা কোথায়? তাহলে কি নিছকই এটা কথার কথা? কিন্তু তাইবা হবে কেন। প্রধানমন্ত্রী যখন কোন কথা বলেন তখন সে কথার অর্থ থাকতে হবে, যুক্তি থাকতে হবে। নতুবা সে কথার কোন ওজন থাকে না। তাৎপর্য থাকে না। আর যদি ব্যাপারটি কৃতিত্ব জাহির করার মানবিক স্বভাবজাত হয়ে থাকে, তাহলেও প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে প্রধানমন্ত্রীকে- কৃতিত্বের উপাদানগুলো কি! আমরা জানি, এ প্রশ্নের কোন সদুত্তর দেয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, ক্ষমতা গ্রহণের পর গত ১০ মাস সময়কালে শিক্ষার উন্নতিকল্পে এমন কিছু তিনি করেননি, যার জন্যে তিনি কৃতিত্বের দাবী করতে পারেন। বরং দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষককে ধর্মঘটের দিকে ঠেলে দিয়ে এবং শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে এই সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছেন, তার জন্যে এই সরকার অনেক দিন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।